কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১৯

সূরা মুজ্জাম্মিল

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের الْمُزَّمِّلُ (আলমুয্যাম্মিল, শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এটা শুধু সূরাটির নাম, এর বিষয়বস্তুর শিরোনাম নয়।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার দুটি রুকূ দুটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে।

প্রথমে রুকূর আয়াতগুলো মক্কায় নাযিল হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত।এর বিষয়বস্তু এবং বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা থেকেও তা বুঝা যায়।তবে প্রশ্ন থেকে যায় যে, মক্কী জীবনের কোন পর্যায়ে তা নাযিল হয়েছিল? হাদীসের বর্ণনাসমূহ থেকে আমরা এর কোন জবাব পাই না। তবে পুরো রুকূটির বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারা এর নাযিল হওয়ার সময়-কাল নির্ণয় করতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়।

প্রথমত, এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাতের বেলা উঠে আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে তাঁর মধ্যে নবুয়াতের গুরু দায়িত্ব বহনের শক্তি সৃষ্টি হয়। এ থেকে জানা গেল যে, এ নির্দেশটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াতের প্রথম যুগে এমন এক সময় নাযিল হয়ে থাকবে যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ পদমর্যাদার জন্য তাঁকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল।

দ্বিতীয়ত, এর মধ্যে তাঁকে তাহজ্জুদ নামাযে অর্ধেক রাত কিংবা তার চেয়ে কম বা বেশী রাত পর্যন্ত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তখন পর্যন্ত কুরআন মজীদের অন্তত এতটা পরিমাণ নাযিল হয়েছিল যা দীর্ঘক্ষণ তিলাওয়াত করা যেতো।

তৃতীয়ত, এ রুকূতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিরোধীদের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারনের উপদেশ এবং মক্কার কাফেরদের আযাবের হুমকি দেয়া হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ রুকূটি যখন নাযিল হয়েছিল তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের প্রকাশ্য তাবলীগ বা প্রচার শুরু করে দিয়েছিলেন এবং মক্কায় তাঁর বিরোধিতাও তীব্রতা লাভ করেছিল।

দ্বিতীয় রুকূ সম্পর্কে মুফাস্সিরগণ যদিও বলেছেন যে, এটিও মক্কায় নাযিল হয়েছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুফাস্সির একে মদীনায় অবতীর্ণ বলে মত ব্যক্ত করেছেন। এ রুকূটির বিষয়বস্তু থেকে এ মতটিরও সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ এর মধ্যে আল্লাহর পথে লড়াই করার উল্লেখ আছে। মক্কায় এর কোন প্রশ্নই ছিল না। এতে ফরযকৃত যাকাত আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এটা প্রমাণিত বিষয় যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে যাকাত দেয়া মদীনাতে ফরয হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

প্রথম সাতটি আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে মহান কাজের গুরু দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হয়েছে তার দায়-দায়িত্ব ঠিকমত পালনের জন্য আপনি নিজেকে প্রস্তুত করুন। এর বাস্তব পন্থা বলা হয়েছে এই যে, আপনি রাতের বেলা উঠে অর্ধেক রাত কিংবা তার চেয়ে বেশী সময় বা কিছু কম সময় পর্যন্ত নামায পড়ুন।

৮ থেকে ১৪ নং পর্যন্ত আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের অধিপতি আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়ে যান। নিজের সমস্ত ব্যাপার তাঁর কাছে সোর্পদ করে দিয়ে নি:শংক ও নিশ্চিন্ত হয়ে যান। বিরোধীরা আপনার বিরুদ্ধে যা বলছে সে ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করুন, তাদের কথায় ভ্রুক্ষেপ করবেন না। তাদের ব্যাপারটা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিন। তিনিই তাদের সাথে বুঝাপড়া করবেন।

এরপর ১৫ থেকে ১৯ নম্বর পর্যন্ত আয়াতে মক্কার যে সমস্ত মানুষ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করেছিলো তাদের এ বলে হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে যে, আমি যেমন ফেরাউনের কাছে রসূল পাঠিয়েছিলাম ঠিক তেমনি তোমাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি। কিন্তু দেখো, আল্লাহর রসূলের কথা না শুনে ফেরাউন কিরূপ পরিণামের সম্মুখীন হয়েছিল। মনে করো, এ জন্য দুনিয়াতে তোমাদের কোন শাস্তি দেয়া হলো না। কিন্তু কিয়ামতের দিনের শাস্তি থেকে তোমরা কিভাবে নিষ্কৃতি লাভ করবে?

এ পর্যন্ত যা বর্ণিত হলো তা প্রথম রুকূর বিষয়বস্তু। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়েরের বর্ণনা অনুসারে এর দশ বছর পর দ্বিতীয় রুকূটি নাযিল হয়েছিল। তাহজুদ নামায সম্পর্কে প্রথম রুকূর শুরুতেই যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এতে তা সহজ করে দেয়া হয়েছে। এখন নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তাহজুদ নামায যতটা সহজ ও স্বাচ্ছন্দে আদায় করা সম্ভব সেভাবেই আদায় করবে। তবে মুসলমানদের যে বিষয়টির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে তাহলো পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতাসহ আদায় করবে। যাকাত যেহেতু ফরয তাই তা যথাযথভাবে আদায় করবে এবং আল্লাহর পথে নিজের অর্থ-সম্পদ বিশুদ্ধ নিয়তে খরচ করবে। সবশেষে মুসলমানদের উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়াতে তোমরা যেসব কল্যাণমূলক কাজ আঞ্জাম দেবে তা ব্যর্থ হবে না। বরং তা এমন সব সাজ-সরঞ্জামের মত যা একজন মুসাফির তার স্থায়ী বাসস্থানে আগেই পাঠিয়ে দেয়। আল্লাহর কাছে পৌছার পর তোমরা তার সবকিছুই পেয়ে যাবে যা দুনিয়া থেকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলে। আগেভাগেই পাঠিয়ে দেয়া এমন সরঞ্জাম-সমগ্রী তোমরা দুনিয়াতে যা ছেড়ে যাবে তার চেয়ে যে শুধু ভাল তাই নয়, বরং আল্লাহর কাছে তোমরা তোমাদের আসল সম্পদের চেয়ে অনেক বেশী পুরষ্কারও লাভ করবে।

ফযীলত

আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ (রহঃ) .... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ সূরা মুযযামমিলের প্রথমাংশ অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবাগণ রোযার মাসের মত রাত জেগে নামায আদায় করতেন। অতঃপর উক্ত সূরার শেষাংশ অবতীর্ণ হয় এবং সূরা মুযযামমিলের প্রথম ও শেষাংশের অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল এক বছরের। (আবু দাউদ ১৩০৫)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন : আমার খালা [রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী] মায়মূনা (রাঃ)-এর ঘরে একদা আমি রাত্রি যাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে সালাত আদায়

করার জন্য উঠলেন। তিনি তের রাকাত সালাত আদায় করলেন, তার মধ্যে ফজরের দু’ রাকাত সুন্নাত। আমি তার প্রত্যেক রাকাতের দাঁড়ানোর পরিমাণ হিসেব করলাম যে, তা ছিল يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ এ সূরার লম্বা সমপরিমাণ। (আবূ দাঊদ হা. ১৩৬৫, সহীহ)

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ

১. হে বস্ত্রাবৃত!

مُزَّمِّلُ এবং পরবর্তী সূরায় ব্যাবহৃত مدثر শব্দদ্বয়ের অর্থ প্রায় এক অর্থাৎ বস্ত্রাবৃত। উভয় সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে একটি সাময়িক অবস্থা ও বিশেষ গুণ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) ভীষণ ভয় ও উদ্বেগের কারণে তীব্র শীত অনুভব করছিলেন এবং বস্ত্রাবৃত হয়েছিলেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে, সর্বপ্রথম হেরা গিরিগুহায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-র কাছে ফেরেশতা জিবরাঈল আগমন করে ইকরা সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান। ফেরেশতার এই অবতরণ ও ওহীর তীব্রতা প্রথম পর্যায়ে ছিল। ফলে এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত খাদিজা (রাঃ)-র নিকট গমন করলেন এবং তীব্র শীত অনুভব করার কারণে বললেন : زملوني زملوني অর্থাৎ ‘আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও।’ এর পর বেশ কিছু দিন পর্যন্ত ওহীর আগমন বন্ধ থাকে। বিরতির এই সময়কালকে ‘ফতরাতুল-ওহী’ বলা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাদীসে এই সময়কালের উল্লেখ করে বলেন: একদিন আমি পথচলা অবস্থায় হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, হেরা গিরিগুহার সেই ফেরেশতা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একস্থানে একটি ঝুলন্ত চেয়ারে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাকে এই আকৃতিতে দেখে আমি প্রথম সাক্ষাতের ন্যায় আবার ভয়ে ও আতংকে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমি গ্রহে ফিরে এলাম এবং গৃহের লোকজনকে বললাম আমাকে বস্তাবৃত করে দাও। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ আয়াত নাযিল হল। এই হাদীসে কেবল এই আয়াতের কথাই বলা হয়েছে। এটা সম্ভবপর যে, একই অবস্থা বর্ণনা করার জন্য يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপের বর্ণনানুযায়ী এই আয়াতের ঘটনা পৃথকও হতে পারে। এভাবে সম্বোধন করার মধ্যে বিশেষ এক করুণা ও অনুগ্রহ আছে। নিছক করুণা প্রকাশার্থে স্নেহ ও ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে সাময়িক অবস্থার দ্বারাও কাউকে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। [তাফসীরে রূহুল মা’আনী]

قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا

২. রাতে সালাতে দাঁড়ান, কিছু অংশ ছাড়া

এখানে বিশেষভঙ্গিতে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তাহাজ্জুদের আদেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতসমূহ ইসলামের শুরুতে এবং কুরআন অবতরণের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয ছিল না। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মে'রাজের রাত্রিতে ফরয হয়েছিল। এই আয়াতে তাহাজ্জুদের সালাত কেবল ফরযই করা হয়নি; বরং তাতে রাত্রির কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ মশগুল থাকাও ফরয করা হয়েছে। আয়াতের মূল আদেশ হচ্ছে কিছু অংশ বাদে সমস্ত রাত্রি সালাতে মশগুল থাকা। এই আদেশ পালনার্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ রাত্রি তাহাজ্জুদের সালাতে ব্যয় করতেন। ফলে তাদের পদদ্বয় ফুলে যায় এবং আদেশটি বেশ কষ্টসাধ্য প্রতীয়মান হয়। পূর্ণ এক বছর পর এই সূরার শেষাংশ (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ) অবতীর্ণ হলে দীর্ঘক্ষণ সালাতে

দন্ডায়মান থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করে দেয়া হয় এবং বিষয়টি ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে ব্যক্ত করা হয় যে, যতক্ষণ সালাত আদায় করা সহজ মনে হয়, ততক্ষণ সালাত আদায় করাই তাহাজ্জুদের জন্যে যথেষ্ট। [ইমাম মুসলিম এই বিষয়বস্তু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন, হাদীস নং: ৭৪৬

نِّصۡفَهٗۤ اَوِ انۡقُصۡ مِنۡهُ قَلِيۡلًا

৩. আধা-রাত বা তার চেয়েও কিছু কম।

আগের আয়াতে اللَّيْلَ শব্দের সাথে আলিফ ও লাম সংযুক্ত হওয়ার অর্থ হয়েছে সমস্ত রাত্রি নামাযে মশগুল থাকুন। অর্থাৎ আপনি সমস্ত রাত্রি নামাযে মশগুল থাকুন কিছু অংশ বাদ দিয়ে অতঃপর এর ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে : نِّصۡفَهٗۤ اَوِ انۡقُصۡ مِنۡهُ قَلِيۡلًا اَوۡ زِدۡ عَلَيۡهِ অর্থাৎ এখন আপনি অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম অথবা কিছু বেশী নামাযে মশগুল হোন। এটা ব্যতিক্রমের বর্ণনা। তাই প্রশ্ন হয় যে, অর্ধেক রাত্রি তো কিছু অংশ হতে পারে না। জওয়াব এই যে, রাত্রির প্রাথমিক অংশ তো মাগরিব ও ইশার নামায ইত্যাদিতে অতিবাহিতই হয়ে যায়। এখন অর্ধেকের অর্থ হবে অবশিষ্ট রাত্রির অর্ধেক। সেটা সারা রাত্রির তুলনায় কিছু অংশ। আয়াতে অর্ধরাত্রির কমেরও অনুমতি আছে, বেশীরও আছে। তাই সমষ্টিগতভাবে এর সারমর্ম এই যে, কম পক্ষে এক-চতুর্থাংশ রাত্রির চেয়ে কিছু বেশী নামাযে মশগুল থাকা। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

اَوۡ زِدۡ عَلَيۡهِ وَ رَتِّلِ الۡقُرۡاٰنَ تَرۡتِيۡلًا

৪. অথবা তার চেয়েও একটু বাড়ান। আর কুরআন তিলাওয়াত করুন ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে

এখানে বলা হয়েছে যে, তারতীল সহকারে পড়তে হবে। ترتيلবলে উদ্দেশ্য হলো ধীরে ধীরে সঠিকভাবে বাক্য উচ্চারণ করা। অর্থাৎ কুরআনের শব্দগুলো ধীরে ধীরে মুখে উচ্চারণ করার সাথে সাথে তা উপলব্ধি করার জন্য গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনাও করতে হবে। [ইবন কাসীর]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুরআন পাঠের নিয়ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, শব্দগুলোকে টেনে টেনে পড়তেন। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পড়ে বললেন যে, তিনি আল্লাহ, রাহমান এবং রাহীম শব্দকে মদ্দ করে বা টেনে পড়তেন।" [বুখারী: ৫০৪৬]

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে একই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক একটি আয়াত আলাদা আলাদা করে পড়তেন এবং প্রতিটি আয়াত পড়ে থামতেন। তিনি 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বলে থামতেন। তারপর 'আর-রাহমানির রাহীম' বলে থামতেন। তারপর 'মালিকি ইয়াওমিদীন' বলে থামতেন। [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৩০২, আবু দাউদ: ১৪৬৬, তিরমিযী: ২৯২৭]

হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদিন রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সালাত পড়তে দাঁড়ালাম। আমি দেখলাম, তিনি এমনভাবে কুরআন তেলাওয়াত করছেন যে, যেখানে তাসবীহের বিষয় আসছে সেখানে তিনি তাসবীহ পড়ছেন, যেখানে দো'আর বিষয় আসছে সেখানে দোআ, করছেন এবং যেখানে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার বিষয় আসছে সেখানে তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। [মুসলিম: ৭৭২]

আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন, একবার রাতের সালাতে কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ আয়াতটির কাছে পৌছলেন “আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা আপনারই বান্দা। আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করে দেন, তাহলে আপনি পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ” তখন তিনি বার বার এ আয়াতটিই পড়তে থাকলেন এবং এভাবে ভোর হয়ে গেল। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/১৪৯]

সাহাবী ও তাবেয়ীগণেরও এই অভ্যাস ছিল। তাছাড়া, যথাসম্ভব সুললিত স্বরে তিলাওয়াত করাও তারতীলের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে নবী সশব্দে সুললিত স্বরে তেলাওয়াত করেন, তার কেরাআতের মত অন্য কারও কেরাআত আল্লাহ তা'আলা শুনেন না। [বুখারী: ৫০২৩, ৫০২৪] তবে পরিস্কার ও বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ চিন্তা করে তদ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়াই আসল তারতীল। অনুরূপভাবে সুন্দর করে পড়াও এর অংশ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যে কুরআনকে সুন্দর স্বরে পড়ে না সে আমার দলভুক্ত নয়।” [বুখারী: ৭৫২৭]

অন্য হাদীসে এসেছে, “তোমরা কুরআনকে তোমাদের সুর দিয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর” [ইবনে মাজহঃ ১৩৪২] আবু মুসা আল-আশা’আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সুমিষ্ট স্বরে কুরআন পাঠ করতেন বিধায় রাসূল তার প্রশংসা করে বলেছিলেন, “তোমাকে দাউদ পরিবারের সুর দেয়া হয়েছে”। [বুখারী: ৫০৪৮, মুসলিম: ৭৯৩] তাছাড়া হাদীসে আরও এসেছে, “কিয়ামতের দিন কুরআনের অধিকারীকে বলা হবে, তুমি পড় এবং আরোহন করতে থাক। সেখানেই তোমার স্থান হবে যেখানে তোমার কুরআন পড়ার আয়াতটি শেষ হবে।” [আবু দাউদ: ১৪৬৪, তিরমিযী: ২৯১৪]

اِنَّا سَنُلۡقِیۡ عَلَیۡکَ قَوۡلًا ثَقِیۡلًا

৫. নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি নাযিল করছি গুরুভার বাণী।

এখানে ভারী বা গুরুতর বাণী বলে পবিত্র কুরআন বোঝানো হয়েছে। গুরুভার বাণী বলার কারণ হলো, তার নির্দেশ অনুসারে কাজ করা অনেক বেশী কঠিন ও গুরুতর কাজ। তাছাড়া এ জন্যও একে গুরুভার ও কঠিন বাণী বলা হয়েছে যে, তার অবতরণের ভার বহন করা অত্যান্ত কঠিন কাজ ছিল। যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল হওয়ার সময় তিনি আমার উরুর ওপর তাঁর উরু, ঠেকিয়ে বসেছিলেন। আমার উরুর ওপর তখন এমন চাপ পড়ছিলো যে, মনে হচ্ছিলো তা এখনই ভেঙে যাবে। [বুখারী: ৭৭৫, ৫০৪৩]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বর্ণনা করেন, আমি প্রচণ্ড শীতের দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অহী নাযিল হতে দেখেছি। সে সময়ও তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরতে থাকতো। [বুখারী: ২] অন্য বর্ণনায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, উটনীর ওপর সওয়ার থাকা অবস্থায় যখনই তার ওপর অহী নাযিল হতো উটনী তখন তার বুক মাটিতে ঠেকিয়ে দিতো। অহী নাযিল শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারতো না। [মুসনাদে আহমাদ: ৬/১১৮, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৫০৫] [ইবনে কাসীর]

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّیۡلِ ہِیَ اَشَدُّ وَطۡاً وَّ اَقۡوَمُ قِیۡلًا

৬. নিশ্চয় রাতের বেলার উঠা প্রবৃত্তি দলনে প্রবলতর এবং বাকস্ফুরাণে অধিক উপযোগী।

نَاشِئَةَ শব্দের ব্যাখ্যায় কয়েকটি মত আছে। একটি মত হলো, এর মানে রাতের বেলা শয্যা ত্যাগকারী ব্যক্তি। দ্বিতীয় মতটি হলো এর অর্থ রাত্রিকালীন সময়। [ইবনে কাসীর]

আয়াতে وطأً শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এতো ব্যাপক যে, একটি মাত্র বাক্যে তা বুঝানো সম্ভব নয়। এর একটি অর্থ হলো, রাতের বেলা ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য শয্যা ত্যাগ করে ওঠা এবং দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা যেহেতু মানুষের স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ, মানুষের মন ও প্রবৃত্তি এ সময় আরাম কামনা করে, তাই এটি এমন একটি কাজ ও চেষ্টা-সাধনা যা প্রবৃত্তির জন্য অত্যন্ত কঠিন। দ্বিতীয় অর্থ হলো, রাত্রিবেলার সালাত দিনের সালাত অপেক্ষা অধিক স্থায়ী ও ফলপ্রসু। কেননা, দিনের বেলা মানুষের চিন্তা-চেতনা বিভিন্ন বিষয়ে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু রাত্রিবেলা তা থেকে মুক্ত হয়। আরেকটি অর্থ হলো, ইবাদতকারী ব্যক্তিকে সক্রিয় রাখার পন্থা, কেননা রাত্রিবেলা বিভিন্ন চিন্তা-চেতনা ও কাজ থেকে মুক্ত হওয়ায় সে সময়ে ইবাদতে নিবিষ্ট হওয়া যায়। [কুরতুবী]

أقوم শব্দের অর্থ অধিক সঠিক। আর قِيلًا শব্দের অর্থ কথা। তাই এর আভিধানিক অর্থ হলো, "কথাকে আরো বেশী যথার্থ ও সঠিক বানায়।" অর্থাৎ রাত্রিবেলায় কুরআন তেলাওয়াত অধিক শুদ্ধতা ও স্থিরতা সহকারে হতে পারে। এর মূল বক্তব্য হলো, সে সময় মানুষ আরো বেশী প্রশান্তি, তৃপ্তি ও মনোযোগ সহকারে বুঝে কুরআন মাজীদ পড়তে পারে। কারণ, তখন বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি ও হট্টগোল দ্বারা অন্তর ও মস্তিস্ক ব্যাকুল হয় না। [দেখুন: ফাতহুল কাদীর] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা এর ব্যাখ্যা করেছেন "গভীর চিন্তা-ভাবনা ও মনোনিবেশসহ কুরআন পাঠের জন্য এটা একটা অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত সময়।" [আবু দাউদ: ১৩০৪]

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا

৭. নিশ্চয় দিনের বেলায় আপনার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।

سَبْحًا শব্দের অর্থ প্রবাহিত হওয়া ও ঘোরাফেরা করা। এ কারণেই সাঁতার কাটাকে سباحة বলা হয়। এখানে এর অর্থ দিনমানের কর্মব্যস্ততা ও জীবিকার জন্য ঘোরাঘুরির কারণে অন্তরের ব্যস্ততা। দিনের কর্মব্যস্ততার কারণে একাগ্রচিত্তে ইবাদতে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই রাত্রি একাজের জন্য থাকা উচিত যে, প্রয়োজন মাফিক নিদ্রা ও আরাম এবং তাহাজ্জুদের ইবাদতও হয়ে যায়।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

৮. আর আপনি আপনার রবের নাম স্মরণ করুন এবং তার প্রতি মগ্ন হোন একনিষ্ঠভাবে।

আপনি সমগ্র সৃষ্টি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিবিধানে ও ইবাদতে মগ্ন হোন। এর সাধারণ অর্থে ইবাদতে শির্ক না করাও দাখিল এবং নিজের সমস্ত কর্মকাণ্ডে তথা উঠাবসায়, চলাফেরায় দৃষ্টি ও ভরসা আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ রাখা এবং অপরকে লাভ-লোকসান ও বিপদাপদ থেকে উদ্ধারকারী মনে না করাও দাখিল। দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুকে পরিত্যাগ করে আল্লাহর কাছে যা আছে তৎপ্রতি মনোনিবেশ করাও এর অর্থের অন্তর্গত। কিন্তু এই تَبْتِيل তথা দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ সেই رهبانية তথা বৈরাগ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কুরআনে যার নিন্দা করা হয়েছে এবং হাদীসে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কেননা, শরীয়াতের পরিভাষায় رهبانية বা বৈরাগ্য এর অর্থ দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং ভোগ সামগ্রী ও হালাল বস্তুসমুহকে ইবাদতের নিয়তে পরিত্যাগ করা।

পক্ষান্তরে এখানে যে সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে, তা এই যে, বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যগতভাবে আল্লাহর সম্পর্কের উপর কোন সৃষ্টির সম্পর্ককে প্রবল হতে না দেয়া। এ ধরণের সম্পর্কচ্ছেদ বিবাহ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় সাংসারিক কাজ-কারবারের পরিপন্থী নয়; বরং এগুলোর সাথে জড়িত থেকেও এটা সম্ভবপর। রাসূলগণের সুন্নত; বিশেষতঃ রাসূলকুল শিরোমণি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সমগ্র জীবন ও আচারাদি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আয়াতে تَبْتِيلًا শব্দ দ্বারা যে অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে, মূলত তা হলো সকল ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য করা এবং এর মাধ্যমে একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী হওয়া।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতেন, আবার বিবাহ করে সংসার গড়েছেন, রোযা রাখতেন আবার রোযা ছাড়তেন, রাতে সালাত আদায় করতেন আবার ঘুমাতেন। এটাই সুন্নাত তরিকা। অতএব এ তরিকা বর্জন করে অন্য তরিকা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ শরীয়ত গর্হিত কাজ। কখনো এমন আমল আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। (সহীহ বুখারী হা. ৫০৬৩)

তাই পার্থিব কর্ম ব্যস্ততার পাশাপাশি সময়-সুযোগ করে নিয়ে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা প্রশংসনীয়। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতসহ যখন কোন আমল করতেন তখন তা নিয়মিত করার চেষ্টা করতেন। যদি রাতে ঘুমের কারণে অথবা অসুস্থতার কারণে তাহজ্জুত আদায় না করতে পারতেন তাহলে দিনে বার রাকাত আদায় করে নিতেন। তবে কখনো তিনি একরাতে কুরআন শেষ করেননি এবং সারা রাত জাগেননি, রমযান ছাড়া অন্য কোন পূর্ণমাস সিয়াম পালন করেননি। (সহীহ ইবনু খুযাইমাহ হা. ১১৭৭)

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا

৯. তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রব, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই; অতএব তাকেই আপনি গ্রহণ করুন কর্মবিধায়করূপে।

যাকে কোন কাজ সোপর্দ করা হয়, অভিধানে তাকে وَكِيلٌ, বলা হয়। কাজেই فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا বাক্যের অর্থ এই যে, নিজের সব কাজ-কারবার ও অবস্থা আল্লাহর কাছে সোপর্দ কর। পরিভাষায় একেই তাওয়াক্কুল বলা হয়। এই সূরায় রসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রদত্ত নির্দেশাবলীর মধ্যে এটা পঞ্চম নির্দেশ। ইমাম ইয়াকুব কারখী (র) বলেন: সূরার শুরু থেকে এই আয়াত পর্যন্ত সুলুক তথা আল্লাহর পথে চলার পাঁচটি স্তরের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে ১. রাত্রিবেলায় আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্জনে গমন, ২. কোরআন পাকে মশগুল হওয়া, ৩. সর্বদা আল্লাহর স্মরণ ৪. সৃষ্টির সাথে সম্পর্কছেদ এবং ৫. তাওয়াক্কুল। তাওয়াক্কুলের সর্বশেষ নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার গুণ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ বর্ণনা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্ত্বা পূর্ব-পশ্চিম তথা সারা জাহানের পালন করা এবং সারা জাহানের প্রয়োজনাদি আগা গোড়া পূর্ণ করার যিম্মাদার, একমাত্র তিনিই তাওয়াক্কুল ও ভরসা করার যোগ্য হতে পারেন এবং তার উপর যে ব্যক্তি ভরসা করবে, সে কখনও বঞ্চিত হবে না। কোরআনের অন্য এক আয়াতে আছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার যাবতীয় প্রয়োজনাদি ও বিপদাপদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

তাওয়াক্কুলের শরীয়তসম্মত অর্থ: আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার অর্থ এরূপ নয় যে, জীবিকা উপার্জন ও আত্মরক্ষার যেসব উপকরণ ও হাতিয়ার আল্লাহ্ তা'আলা দান করেছেন, সেগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে আল্লাহর উপর

ভরসা করতে হবে। বরং তাওয়াক্কুলের স্বরুপ এই যে, উদ্দেশ্য সাধনে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি, সামর্থ্য ও উপকরণাদি পুরোপুরি ব্যবহার কর, কিন্তু বৈষয়িক উপকরণাদিতে অতিমাত্রায় মগ্ন হয়ে যেও না। ইচ্ছাধীন কাজকর্ম সম্পন্ন করার পর ফলাফল আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও।

তাওয়াক্কুলের এই অর্থ স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম বগভীও বায়হাকী (রঃ) বর্ণিত এক হাদীসে তিনি বলেনঃ ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তখন পর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হবে না, যে পর্যন্ত যে তার অবধারিত ও লিখিত রিযিক পুরোপুরি হাসিল না করে। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জনে এতদূর মগ্ন হয়ো না যে, অন্তরের সমস্ত অভিনিবেশ বৈষয়িক উপকরণাদির মধ্যেই সীমিত থেকে যায় এবং তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা কর। তিরমিযীতে আবূ যর গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : দুনিয়া ত্যাগ এর নাম নয় যে, তোমরা হালালকৃত বস্তুসমূহকে নিজেদের জন্য হারাম করে নেবে অথবা নিজেদের ধন-সম্পদ অযথা উড়িয়ে দেবে। বরং দুনিয়া ত্যাগের অর্থ এই যে, তোমাদের কাছে যা আছে, তার তুলনায় আল্লাহর কাছে যা আছে তার উপর তোমাদের ভরসা বেশী হবে। [তাফসীরে মাযহারী]

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا

১০. আর লোকে যা বলে, তাতে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং সৌজন্যের সাথে তাদেরকে পরিহার করে চলুন।

আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে রিসালাত গ্রহণের প্রস্তুতি, আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মগ্ন হওয়া ইত্যাদি নির্দেশের পর অত্র আয়াতগুলোতে কাফির-মুশরিকদের মিথ্যা অপবাদ, অকথ্য গালিগালাজ এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপে ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি তাদেরকে সৌজন্যতার সাথে পরিহার করার উপদেশ দিচ্ছেন। কারণ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের স্বভাব হল তারা সত্য গ্রহণ করবে না, বরং সত্যাগ্রহীদের অপবাদ দেবে, গালিগালাজ করবে এবং তাদের নিয়ে ঠাট্টা-ব্যঙ্গ করবে। এটা নতুন নয়, পূর্বেও ফিরআউন সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে তাকে পাকড়াও করেছিলাম। তাই এসব সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও মিথ্যুকদেরও পাকড়াও করব এবং তাদের জন্য আখিরাতে ন্যাক্কারজনক শাস্তি প্রস্তুত করা আছে।

"আলাদা হয়ে যাও" কথাটির অর্থ এই নয় যে, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ইসলামের তাবলীগের কাজ বন্ধ করে দাও। বরং এর অর্থ হলো, তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করো না, তাদের অন্যায় ও অর্থহীন আচরণ উপেক্ষা করে চলো এবং তাদের কোন অভদ্র আচরণের জবাব দিও না। তবে তাদের প্রতি এ উপেক্ষা এবং নির্লিপ্ততাও যেন কোন প্রকার ক্ষোভ, ক্রোধ এবং বিরক্তিসহ না হয়। বরং তা যেন এমন উপেক্ষা হয়, যেমন একজন ভদ্র মানুষ কোন অসভ্য বাউণ্ডেলে বা বখাটে লোকের গালি শুনে যেমন তা উপেক্ষা করে এবং মনকে ভারাক্রান্ত হতে পর্যন্ত দেয় না। এ থেকে এরূপ ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়া ঠিক নয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মপদ্ধতি বোধ হয় এ থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের ছিল। তাই আল্লাহ তাঁকে এ আদেশ করেছেন। তিনি মূলত প্রথম থেকেই এ কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করেছিলেন। তবে কুরআনে এ নির্দেশ দেয়ার উদ্দেশ্য হলো কাফেরদের একথা জানিয়ে দেয়া যে, তোমরা যে আচরণ করছো তার জবাব না দেয়ার কারণ দুর্বলতা নয়। বরং এরূপ আচরণের জবাবে আল্লাহ তাঁর রসূলকে এ ধরনের ভদ্রজনোচিত পন্থা গ্রহণ করার শিক্ষা দিয়েছেন।

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا

১১. আর ছেড়ে দিন আমাকে ও মিথ্যারোপকারীদেরকে; এবং কিছু কালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দিন,

আয়াতে কাফিরদেরকে أُولِي النَّعْمَةِ বলা হয়েছে। نعمة শব্দের অর্থ ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য। এতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে যাওয়া পরকাল অবিশ্বাসীরই কাজ হতে পারে। মু'মিনও মাঝে মাঝে এগুলো প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে তাতে মত্ত হয়ে পড়ে না। দুনিয়ার আরাম-আয়েশের মধ্যে থেকেও তার অন্তর পরকাল চিন্তা থেকে মুক্ত হয় না।

একথা থেকে এ মর্মে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মক্কায় যেসব লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ করছিল এবং নানাভাবে ধোঁকা দিয়ে এবং নানা রকমের স্বার্থপ্রীতি সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষ উস্কে দিয়ে তাঁর বিরোধিতায় নামছিল তারা সবাই ছিল জাতির সচ্ছল, সম্পদশালী ও বিলাসপ্রিয় মানুষ। কারণ ইসলামের এ সংস্কার আন্দোলনের আঘাত তাদের স্বার্থের ওপর সরাসরি পড়ছিল। কুরআন আমাদের বলে যে, এ আচরণ শুধু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেই ছিল না বরং যে গোষ্ঠী চিরদিনই সংস্কার ও সংশোধনের পথ রুদ্ধ করার জন্য জগদ্দল পাথরের মত বাধা সৃষ্টি করে এসেছে।

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَ جَحِيمًا

১২. নিশ্চয় আমাদের কাছে আছে শৃংখলসমূহ ও প্রজ্বলিত আগুন,

অতঃপর আখেরাতের কঠিনতম শাস্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে أَنْكَال শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ আটকাবস্থা ও শিকল। জাহান্নামে পাপী ও অপরাধীদের পায়ে ভারী বেড়ী পরানো হবে। তারা যাতে পালাতে না পারে সেজন্য এ বেড়ি পরানো হবে না, বরং তা পরানো হবে এজন্য যে, তারা যেন উঠতে না পারে। এ বেড়ি পালিয়ে যাওয়ার রোধ করার জন্য নয় বরং শাস্তি বৃদ্ধি করার জন্য।

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا

১৩. আর আছে এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

এরপর জাহান্নামের উল্লেখ করে জাহান্নামীদের ভয়াবহ খাদ্যের কথা বলা হয়েছে। (وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ) এর অর্থ গলগ্রহ খাদ্য। অর্থাৎ যে খাদ্য গলায় এমনভাবে আটকে যায় যে, গলাধঃকরণও করা যায় না এবং উদগীরণও করা যায় না। জাহান্নামীদের খাদ্য ضريع, غسلينও زقومএর অবস্থা তাই হবে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, তাতে আগুনের কাটা থাকবে; যা গলায় আটকে যাবে। [কুরতুবী]
শেষে বলা হয়েছে: (وَعَذَابًا أَلِيمًا) নির্দিষ্ট আযাব উল্লেখ করার পর একথা বলে এর আরও অধিক অন্যান্য শাস্তির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا

১৪. সেদিন যমীন ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ বিক্ষিপ্ত বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে।

সে সময় অতি শক্ত-মজবুত পাহাড়সমূহ দূর্বল হয়ে পড়বে, তাই প্রথমে তা মিহি বিক্ষিপ্ত বালুর স্তুপে পরিণত হবে। অতঃপর বালুর এ স্তুপ বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়ে যাবে। এরপর গোটা ভূপৃষ্ঠ একটা বিশাল প্রান্তরে রূপান্তরিত হবে। এ অবস্থার একটি চিত্র অন্যত্র এভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, "লোকেরা আপনাকে এসব পাহাড়ের অবস্থা কি হবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, আমার রব পাহাড়সমূহকে ধুলির মত করে ওড়াবেন এবং ভূপৃষ্ঠকে এমন সমতল বিশাল প্রান্তরে রূপান্তরিত করবেন যে, তুমি সেখানে উঁচু নীচু বা ভাঁজ দেখতে পাবে না। " [সূরা ত্বা-হা: ১০৫-১০৭]

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا

১৫. নিশ্চয় আমরা তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি এক রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ যেমন রাসূল পাঠিয়েছিলাম ফির'আউনের কাছে

মক্কার যেসব কাফের রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করেছিলো এবং তাঁর বিরোধিতায় অতি মাত্রায় তৎপর ছিল এখানে তাদের উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে।

লোকদের জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাক্ষী বানিয়ে পাঠানোর একটি অর্থ হলো, তিনি দুনিয়ায় তাদের সামনে নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে সত্যের সাক্ষ্য পেশ করবেন। আরেকটি হলো, আখেরাতে যখন আল্লাহর আদালত কায়েম হবে সে সময় তিনি সাক্ষ্য দেবেন যে, এসব লোকের কাছে আমি সত্যের আহবান পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম।

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا

১৬. কিন্তু ফিরআউন সে রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমরা তাকে অত্যন্ত শক্তভাবে পাকড়াও করেছিলাম।

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا

১৭. অতএব যদি তোমরা কুফরী কর, তবে কি করে আত্মরক্ষা করবে সেদিন যে দিনটি কিশোরদেরকে পরিণত করবে বৃদ্ধে,

شِيْبٌ হল أَشْيَبُ এর বহুবচন। কিয়ামতের দিন কিয়ামতের ভয়াবহতায় শিশুরা সত্যিকারেই বৃদ্ধ হয়ে যাবে। অথবা কেবল উপমাস্বরূপ এ রকম বলা হয়েছে। হাদীসেও এসেছে যে, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ আদম (আঃ)-কে বলবেন, তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে বের করে নাও। তিনি বলবেন, 'হে আল্লাহ! কেমন করে?' মহান আল্লাহ বলবেন, 'প্রত্যেক হাজার থেকে ৯৯৯ জনকে।' সেই দিন গর্ভবতীর গর্ভস্থ ভ্রূণ খসে পড়বে এবং শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে।" ব্যাপারটা সাহাবায়ে কেরামদের নিকট বড় কঠিন মনে হল এবং তাঁদের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তা দেখে রসূল (সাঃ) বললেন, "ইয়া'জূজ-মা'জূজ সম্প্রদায় থেকে ৯৯৯ জন হবে এবং তোমাদের থেকে একজন। আল্লাহর দয়ায় আমি আশা করি, সমস্ত জান্নাতীদের মধ্যে আমরা অর্ধেক হব।" (বুখারী, তাফসীর সূরাতুল হাজ্জ)

السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا

১৮. সে-দিন আসমান হবে বিদীর্ণ তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

১৯. এটা এক উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।

(إِنَّ هَٰذِهِ) অর্থাৎ এ সূরাটি একটি উপদেশ। এতে সত্য গ্রহণের পাথেয় ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার খারাপ পরিণামের বিবরণ রয়েছে। অতএব যারা চায় প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করতে তারা যেন এখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। যে কেউ হিদায়াত প্রার্থী হবে সেই প্রতিপালকের মর্জি হিসেবে হিদায়াতের পথ পেয়ে যাবে এবং তাঁর কাছে পৌঁছে যাওয়ার ওয়াসীলা লাভ করবে। যেমন অন্য সূরায় বলেনঃ "তোমরা ইচ্ছা করবে না যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (৭৬:৩০) ।

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

২০. নিশ্চয় আপনার রব জানেন যে, আপনি সালাতে দাঁড়ান কখনও রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধাংশ এবং কখনও এক-তৃতীয়াংশ এবং দাঁড়ায় আপনার সঙ্গে যারা আছে তাদের একটি দলও। আর আল্লাহ্ই নির্ধারণ করেন দিন ও রাতের পরিমাণ। তিনি জানেন যে, তোমরা এটা পুরোপুরি পালন করতে পারবে না। তাই আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করলেন। কাজেই কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়, আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, আর কেউ কেউ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমন করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। কাজেই তোমরা কুরআন হতে যতটুকু সহজসাধ্য ততটুকু পড়। আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম পাঠাবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর কাছে। তা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহর কাছে; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরার শুরুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সকল মুসলিমের উপর তাহাজ্জুদ ফরয করা হয়েছিল এবং এই সালাত অর্ধারাত্রির কিছু বেশী এবং কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত দীর্ঘ হওয়াও ফরয ছিল। আল্লাহর জ্ঞান অনুযায়ী যখন এর উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তাহাজ্জুদের ফরয রহিত করে সে নির্দেশ শিথিল ও সহজ করে দেয়া হলো। [দেখুন: কুরতুবী]

تُحْصُوهُএর মূল হলো إحصاءযার অর্থ গণনা করা। যেমন, পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, (وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا)"আর তিনি (আল্লাহ) সবকিছু সংখ্যায় গণনা করে রেখেছেন।" [সূরা আল-জিন্ন: ২৮] অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, তোমরা এর গণনা করতে পারবে না। তাহাজ্জুদের সালাতে আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে এই সালাতে মশগুল থাকা অবস্থায় রাত্র কতটুকু হয়েছে, তা জানা কঠিন ছিল। [দেখুন: কুরতুবী; সা'দী]

আবার কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, إحصاء অর্থ কোন কিছু যথানিয়মে কাজে লাগানো বা সক্ষম হওয়া। সে হিসেবে এখানে (لَنْ تُحْصُوهُ) শব্দের অর্থ দীর্ঘ সময় এবং নিদ্রার সময়ে প্রত্যেকে যথারীতি সালাত পড়তে সক্ষম না হওয়া। [তাবারী] এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার এসেছে, যেমন হাদীসে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, من أحصاها دخل الجنة অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আল্লাহর নামসমূহকে কর্মের ভিতর দিয়ে পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলে সে জান্নাতে দাখিল হবে।" [বুখারী: ৬৪১০, মুসলিম: ২৬৭৭]।

تاب শব্দের আসল অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। গোনাহের তাওবাকেও এ কারণে তাওবা বলা হয় যে, মানুষ এতে পূর্বের গোনাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করে। কেউ কেউ বলেন, এখানে কেবল প্রত্যাহার বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ফরয তাহাজ্জুদের আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

فَاقْرَأُوا(কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর) এর অর্থ হল, فَصَلُّوا(তোমরা নামায পড়)। আর 'কুরআন' বলতে এখানে الصَّلَاةَ(নামায) বুঝানো হয়েছে। যেহেতু তাহাজ্জুদের নামাযে কিয়াম (দাঁড়ানো) অনেক লম্বা হয় এবং কুরআন খুব বেশী পড়া, তাই তাহাজ্জুদের নামাযকেই কুরআন বলে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া একান্ত জরুরী হওয়ার কারণে মহান আল্লাহ হাদীসে ক্বুদসীতে এটা (সূরা ফাতিহা)-কে 'নামায' বলে আখ্যায়িত করেছেন, قَسَّمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي । কাজেই 'যতটুকু কুরআন পড়া সহজ হয়, ততটুকু পড়'এর অর্থ হল, রাতে যত রাকআত নামায পড়া সহজসাধ্য হয়, তত রাকআত পড়ে নাও। এর জন্য না সময় নির্ধারণের প্রয়োজন আছে, আর না রাকআতের ব্যাপারে কোন ধরাবাঁধা সংখ্যা আছে। এই আয়াতের ভিত্তিতে কেউ কেউ বলেছেন যে, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া জরুরী নয়। যার জন্য কুরআনের যে অংশ পড়া সহজ, সে তা পড়ে নেবে। কেউ যদি কুরআনের যে কোন স্থান থেকে একটি আয়াতও পড়ে নেয়, তারও নামায হয়ে যাবে। কিন্তু প্রথমতঃ এখানে কুরআন বা 'ক্বিরাআত' অর্থ নামায যা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অতএব আয়াতের সম্পর্ক এর সাথে নেই যে, নামাযে কতটা ক্বিরাআত পড়া জরুরী? দ্বিতীয়তঃ যদি মেনেও নেওয়া যায় যে, এর সম্পর্ক ক্বিরাআতের সাথে, তবুও এ দলীলের মধ্যে কোন শক্তি নেই। কেননা, مَا تَيَسَّرَ তফসীর স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) করে দিয়েছেন। অর্থাৎ, কমসে-কম যে ক্বিরাআত ব্যতীত নামায হয় না তা হল, সূরা ফাতিহা। এই জন্যই তিনি বলেছেন, এটা (সূরা ফাতিহা) অবশ্যই পড়। যেমন সহীহ এবং অত্যধিক শক্তিশালী ও স্পষ্ট হাদীসমূহে এ নির্দেশ রয়েছে। নবী করীম (সাঃ) এর ব্যাখ্যার বিপরীত এই বলা যে, 'নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া জরুরী নয়, বরং যে কোন একটি আয়াত পড়লেই নামায হয়ে যাবে' বড়ই দুঃসাহসিকতা এবং নবী (সাঃ)-এর হাদীসকে কোন গুরুত্ব না দেওয়ারই নামান্তর। অনুরূপ এটা ইমামদের উক্তিরও বিপরীত। তাঁরা উসূলের কিতাবগুলোতে লিখেছেন যে, এই আয়াতকে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়ার দলীল হিসাবে গ্রহণ করা ঠিক নয়। কারণ, দু'টি আয়াত পরস্পর বিপরীতমুখী। তবে কেউ যদি জেহরী (মাগরেব, এশা, ফজর, জুমআহ, তারাবীহ, ঈদ প্রভৃতি) নামাযে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়ে, তাহলে ইমামদের কেউ কেউ কোন কোন হাদীসের ভিত্তিতে তা জায়েয বলেছেন। আবার কেউ তো না পড়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

হালাল ও বৈধ উপায়ে রুজি অর্জনের উদ্দেশে সফর করাকে কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর মেহেরবাণী ও করুণা অনুসন্ধান বলে আখ্যায়িত করেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কাজ-কর্মের জন্য সফর করবে। এক শহর থেকে অন্য শহরে অথবা এক দেশ থেকে অন্য এক দেশে যাতায়াত করবে। ফলে রাতের সালাত আদায় কষ্টকর হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ তা'আলা এ বিধান সহজ করে নফলের পর্যায়ে রাখলেন। অনুরূপ জিহাদেও সফরের কষ্ট ও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। আর এই তিনটি জিনিসেরই --অসুস্থতা, সফর এবং জিহাদ-- পালাক্রমে

সকলেই শিকার হয়ে থাকে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা রাতে কিয়াম করার জরুরী নির্দেশকে শিথিল করে দেন। কেননা, এই তিনটি অবস্থাতে এ কাজ অতি কঠিন এবং বড়ই ধৈর্যসাপেক্ষ কাজ।

শিথিল ও হাল্কা করার কারণসমূহ বর্ণনার সাথে এখানে পুনরায় উক্ত নির্দেশ হাল্কা করার কথাকে তাকীদ স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর- এখানে নামায কায়েম করা এবং যাকাত দেয়া বলতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায এবং ফরয যাকাত বুঝানো হয়েছে।

এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ- মূলত এখানে ফরয ও নফল দান-খয়রাত ও কার্যাদি বোঝানো হয়েছে। আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে এমনভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যেন ব্যয়কারী আল্লাহকে ঋণ দিচ্ছে। কেউ কেউ এর অর্থ এই নিয়েছেন যে, যাকাত ছাড়াও অনেক আর্থিক ওয়াজিব পাওনা মানুষের উপর বর্তে; যেমন: স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ ইত্যাদি। আল্লাহর রাস্তায় প্রয়োজন ও সাধ্যমত ব্যয় কর। এটাকে 'ক্বারযে হাসানা' (উত্তম ঋণ) নামে এই জন্য আখ্যায়িত করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ এর পরিবর্তে সাতশ গুণ বরং তার থেকেও বেশী সওয়াব দান করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? তিনি তার জন্যে এটা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন।" (২:২৪৫)

তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম পাঠাবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর কাছে- এর অর্থ হলো, আখেরাতের জন্য যা কিছু তোমরা আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে তা তোমাদের ঐ সব জিনিসের চেয়ে অনেক বেশী উপকারী যা তোমরা দুনিয়াতেই রেখে দিয়েছে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্ত কোন কল্যাণকর কাজে ব্যয় করোনি। হাদীসে উল্লেখ আছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের এমন কেউ আছে যার নিজের অর্থ-সম্পদ তার উত্তরাধিকারীর অর্থ-সম্পদের চেয়ে তার কাছে বেশী প্রিয়? জবাবে লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে কেউ-ই এমন নেই যার নিজের অর্থ-সম্পদ তাঁর কাছে তার উত্তরাধিকারীর অর্থ-সম্পদ থেকে বেশী প্রিয় নয়। তখন তিনি বললেনঃ তোমরা কি বলছে তা ভেবে দেখো। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের অবস্থা আসলেই এরূপ। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের নিজের অর্থ-সম্পদ তো সেইগুলো যা তোমরা আখেরাতের জন্য অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছে। আর যা তোমরা রেখে দিয়েছে সেগুলো ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীদের অর্থ-সম্পদ। [বুখারী: ৬৪৪২] [ইবন কাসীর]

ফুটনোট

▣ তাহাজ্জুদ করা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ এবং এতে কুরআন তিলাওয়াত করাও অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ।

▣ তারতীলের সাথে অর্থাৎ ধীরে সুস্পষ্টভাবে কুরআন তেলাওয়াতের কথা বলা হয়েছে।

▣ প্রত্যকে দিনে এমন কিছু সময় আলাদা করে রাখা উচিত যাতে মনোযোগ শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে থাকে, কোনো রকম বিভ্রান্তি ছাড়াই।

▣ আল্লাহর একটি পরিচয় এ সূরায় বলা হয়েছে যে, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রব।

⊡ সকল ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য করা এবং এর মাধ্যমে একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী হওয়া।

⊡ আল্লাহর পথে চলার পাঁচটি স্তরের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে ১. রাত্রিবেলায় আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্জনে গমন, ২. কোরআন পাকে মশগুল হওয়া, ৩. সর্বদা আল্লাহর স্মরণ ৪. সৃষ্টির সাথে সম্পর্কছেদ এবং ৫. তাওয়াক্কুল।

⊡ তাওয়াক্কুলের স্বরুপ এই যে, উদ্দেশ্য সাধনে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি, সামর্থ্য ও উপকরণাদি পুরোপুরি ব্যবহার কর, কিন্তু বৈষয়িক উপকরণাদিতে অতিমাত্রায় মগ্ন হয়ে যেও না। ইচ্ছাধীন কাজকর্ম সম্পন্ন করার পর ফলাফল আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও।

⊡ কুরআন একটি উপদেশবানী; যে কেউ এটি থেকে উপকৃত হতে পারে এবং সর্বশক্তিমানের কাছে পৌঁছাতে পারে।

⊡ কাফির-মুশরিকদের মিথ্যা অপবাদ, অকথ্য গালিগালাজ এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপে ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি তাদেরকে সৌজন্যতার সাথে পরিহার করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

⊡ হালাল ও বৈধ উপায়ে রুজি অর্জনের উদ্দেশে সফর করাকে কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর মেহেরবাণী ও করুণা অনুসন্ধান বলে আখ্যায়িত করেছে।

⊡ তিনটি অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা সকল ফরয বিধান সহজ করে নফলের পর্যায়ে রাখলেন। এই তিনটি হলো- অসুস্থতা, সফর এবং জিহাদ- পালাক্রমে সকলেই শিকার হয়ে থাকে।

⊡ আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, কারণ আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

⊡ আল্লাহর রাস্তায় প্রয়োজন ও সাধ্যমত ব্যয় কর। এটাকে 'ক্বারযে হাসানা' (উত্তম ঋণ) নামে এই জন্য আখ্যায়িত করা হয়েছে।